ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 860- 868
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.299

পূর্ব মেদিনীপুরে লোকসংগীত চর্চার ধারা: পটুয়া গান

ড. অনুরূপা হাজরা, *রাজ্য সাহায্য প্রাপ্ত কলেজ শিক্ষক, বিভাগীয় প্রধান, সংগীত বিভাগ, খেজুরী কলেজ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 15.03.2026; Accepted: 17.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Folk songs express the emotions of the human mind in simple and straightforward language through music. When the life stories of common people are presented in such plain and rustic melodies, they become deeply appealing. Folk music is a form of expression in which the joys and sorrows of a simple, unadorned lifestyle are conveyed through songs. Because of its uncomplicated language, folk songs easily find a place in people's hearts. The richness of melody and the charm of rhythm and cadence give folk music its aesthetic beauty. Many people also earn their livelihood through this tradition, which is why folk music has gained popularity as a means of sustenance.

Patuya Gaan is one such genre of folk music that portrays various aspects of society with the help of scroll paintings (patachitra). In this tradition, song, poetry, and visual art blend seamlessly into one. In the district of Purba Medinipur, this form of folk music holds a significant place. It has a close relationship with visual art, as Patuya or scroll painters create long narrative paintings on cloth or paper and present the sequential stories through songs. For this reason, it is often referred to as Pata Gaan as well.

Patuya artists travel from place to place, creating scroll paintings with colors and brushes, and performing poetic songs to entertain people while earning their livelihood. These songs generally revolve around religious, mythological, social, and contemporary themes. Stories from the Ramayana and Mahabharata, Manasamangal, Chandimangal, various folk tales, as well as themes of education, health, and natural disasters, often become the subject matter of these performances. As the song progresses, the scroll is gradually unfolded, allowing the audience to follow the narrative visually.

In various villages of Purba Medinipur, especially during rural fairs, festivals, and social gatherings, Patuya Gaan is performed. It is not only a medium of entertainment but also an important tool for education and social awareness. The artists of the Patuya community have preserved this art form across generations. As an integral part of the folk culture of Purba Medinipur, Patuya Gaan represents a unique folk art where music, painting, and storytelling come together to create a distinctive cultural expression.

Keywords: Folk Music, Patuya Gaan, Patachitra, Cultural Heritage, Purba Medinipur

পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম বৈচিত্র্যপূর্ণ জেলা হল মেদিনীপুর। ১৯৭১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী আয়তন ও জনবহুলতায় পশ্চিমবঙ্গের বৃহত্তম জেলা এটি। বিহার ও উড়িষ্যা রাজ্যের দুই প্রান্তকে ছুঁয়ে রয়েছে এই সীমারেখা। এই জেলার উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে রয়েছে অরণ্যাকীর্ণ লাল মাটির রুক্ষতা এবং দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলে বঙ্গোপসাগরের বিস্তীর্ণ বালুকাময় তটভূমি উর্বর সমতল ভূমি ও ছোট বড় কয়েকটি নদীর শাখা উপশাখায় পরিব্যপ্ত অর্থাৎ একদিকে সুজলা সুফলা নদীমাতৃক বঙ্গের পল্লী অধ্যুষিত শস্য শ্যামলা ভূখণ্ড এবং অন্যদিকে নিবিড় অরণ্যানি ঘেরা লাল মাটি। এই দ্বিবিধ প্রাকৃতিক পরিবেশের জনজীবন, শিল্প সংস্কৃতিও তাই স্বাভাবিকভাবে দ্বিধা বিভক্ত। ২০০৩ সালে এই বৃহত্তম জেলাটি দুইভাগে বিভক্ত হয়ে যায়- পূর্ব মেদিনীপুর ও পশ্চিম মেদিনীপুর। পূর্ব মেদিনীপুর জেলা হলদিয়া, তমলুক, কাঁথি ও এগরা এই চারটি ভাগ নিয়ে গঠিত। সংগীত চর্চার ক্ষেত্রে এই দুই জেলারই ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যের অবদান রয়েছে। এখানে একদিকে ধ্রুপদী উচ্চাঙ্গ সংগীতের চর্চা যেমন হয়েছে তেমনি লোকসংগীতের অনুশীলনও হয়েছে।

শিল্প ও স্থাপত্যের মতো সংগীতও ভারতীয় সংস্কৃতির অন্যতম অঙ্গ। এটি একটি কলা বিদ্যা। সারা ভারতে সংগীত চর্চার সাথে সাথে পূর্ব মেদিনীপুরেও সংগীতের বিকাশ ঘটে। এই জেলার নানা স্থানে শাস্ত্রীয় সংগীত চর্চার বিভিন্ন কেন্দ্র (তমলুক, মহিষাদল কাঁথি প্রভৃতি) যেমন গড়ে উঠেছিল তেমনি লোকসঙ্গীতের বিশেষ সমাদরও ছিল। অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলার লোকসংগীত প্রধানত উৎসবের অঙ্গ হিসেবে বিভিন্ন পালা পার্বণে গাওয়া হত। এই জেলার পশ্চিমাঞ্চলে বর্ণ হিন্দুদের সংস্কৃতির পাশাপাশি উপজাতি ও আদিবাসীদের পূজা পরম অনুষ্ঠানে লোকগীতির প্রচলন তাদের সংস্কৃতির পরিচয় বহন করে। এই উৎসব অনুষ্ঠান হতো সাধারণ ঘটনাকে কেন্দ্র করেই। সহজ-সরল অনাড়ম্বর জীবন যাপনের সঙ্গে আনন্দ, দুঃখের বহিঃপ্রকাশ ঘটে এই লোক উৎসবের মধ্য দিয়ে। আর এই উৎসবের প্রধান অঙ্গ হল লোকসংগীত।

লোকসংগীত:

আঞ্চলিক সাহিত্য, সংগীত সমাজের দর্পণ স্বরূপ। বিশেষতঃ সংগীতের মধ্য দিয়ে সমাজ জীবনের ছায়া প্রতিভাত হয়। স্বভাবতই লোকসংগীত হল আঞ্চলিক সম্পদ। বিচিত্র পরিবেশে শ্রমজীবী মানুষের কণ্ঠে এই গান শোনা যায়। একে উচ্চতর সংগীতের সঙ্গে কোনোভাবেই তুলনা করা যায় না। সহজ কথা ও সরল সুরে, নৈসর্গিক নির্ভরতাপূর্ণ আঞ্চলিক ভাষা ও সুরে লোকগান রচয়িতা মনের আবেগে গেয়ে ওঠেন এবং সেই গান যুগ পরম্পরায় মুখে মুখে চলতে থাকে। প্রাকৃতিক উপমা, দৈনন্দিন বাস্তব জীবনের প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠে এই গানে। পল্লী অঞ্চলের বিভিন্ন পর্যায়ের মানুষজন এবং তাদের পারিপার্শ্বিকতা লোকগানে খুব সহজে জায়গা করে নেয়।

লোকগানের ভাষা সহজ সরল হওয়ায় এবং সুরের ঐশ্বর্য ও তাল ছন্দের মনোহারিত্ব লোকগানকে নান্দনিকতা দান করেছে। যা মানুষের হৃদয়ের গান ও প্রাণের গানে পরিণত হয়েছে। জাত পাতের সংকীর্ণ বিচার আচার দূরীকরণে এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষায় লোকগানের ভূমিকা উল্লেখ্য। আচার অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে, কর্মসঙ্গীত রূপে, আদিবাসী সংগীত, অবসর বিনোদনের সংগীত ইত্যাদি রূপে লোকসংগীত যেমন প্রচলিত তেমনি জীবিকাশ্রয়ী সংগীত হিসাবেও লোকসংগীত প্রযুক্ত হয়। যার মধ্যে পটুয়া গান অন্যতম। তবে এই গান ছাড়াও বাউল, কাঠি নাচ, টুসু, ঝুমুর প্রভৃতি লোকসংগীত মেদিনীপুরে বিশেষভাবে প্রচলন ছিল। আলোচ্য লেখনীতে পটুয়া ও পটুয়া গান সম্পর্কে উপস্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছে।

পটচিত্র, উইকিপেডিয়া

পট ও পটুয়া গান:

পট হল অন্যতম একটি লোকশিল্প। এই পট শব্দটি সংস্কৃত পট্ট বা পাটজাত শব্দ থেকে এসেছে বলে মনে করা হয়। পট্টের অর্থ কাপড়ের ফালি। এই পট্টের উপর আঁকা চিত্রই হল পটচিত্র। পট বিভিন্ন ধরনের হয়- দেওয়াল চিত্রন, পুঁথির পাটাচিত্র এক ধরনের পট, দেব দেবীর মাহাত্ম্য অঙ্কন আরেক ধরনের পট। যাঁরা এই পট দেখিয়ে গান গেয়ে জীবিকা নির্বাহ করেন তাদের বলা হয় পটুয়া। এরা পটীদার বা চিত্রকর নামেও পরিচিত। পটের গানের প্রধান উপাদান হল পটচিত্র শিল্পকলা। এর মধ্যে রয়েছে চিত্র ও সংগীতের আশ্চর্য সহমর্মিতা। পটুয়ারা একাধারে ছিলেন কবি, গীতিকার ও সুরকার। তাদের সুরের টানে পটের চিত্রকে জীবন্ত করে ফুটিয়ে তুলেছেন এবং গেয়েছেন জীবনের গান। যা পটুয়া গান নামে পরিচিত। চিত্র দেখানোর সাথে সাথে চিত্রকরগণ গান গেয়ে বাড়ি বাড়ি ভিক্ষা করেন। এই সকল গানে কোন তাল নেই। পদান্ত মিল যুক্ত বাক্য একটা সাদামাঠা একঘেয়ে সুরে আবৃত্তি করা হয়। পটুয়াগণ যে পট আঁকেন সেই পট সাধারণতঃ দুই প্রকার হয়। এক শ্রেণী চিত্র সম্বলিত ছোট ছোট পট আঁকেন যা 'টোকো' পট নামে পরিচিত। আর অন্য শ্রেণি বহু চিত্র সমন্বিত পরপর ছবি এঁকে পট তৈরি করেন যেগুলি 'দীঘল পট' নামে পরিচিত। এই পট আট দশ হাত থেকে শুরু করে কুড়ি পঁচিশ হাত পর্যন্ত দীর্ঘ হয়। এই দীঘল পট অবলম্বন করে পটুয়ারা গান রচনা করেন এবং অর্থ উপার্জন করেন।

পটুয়া গানে চিত্রের হুবহু বর্ণনা থাকে না। কাহিনির দিক থেকে দেখতে গেলে চিত্রগুলি বিচ্ছিন্ন মনে হয়। তবে এক চিত্র থেকে অন্য চিত্রের বিষয়বস্তু বিশ্লেষণের সময় যে ফাঁক থাকে সেগুলি গান দিয়ে পূর্ণ করেন পটুয়াগণ। এইভাবে গান ও চিত্র একে অপরের পরিপূরক হয়ে ওঠে।

ঐতিহাসিক পটভূমি:

লোকশিক্ষার অন্যতম বাহক এই পট ও পটুয়া সঙ্গীত। অনুমান করা হয় এই পটচিত্র প্রদর্শনী ভারতবর্ষে খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক অর্থাৎ বুদ্ধদেবের সময় থেকে প্রচলিত ছিল।[১] বিভিন্ন ভারতীয় সাহিত্যে পটচিত্রের উল্লেখ রয়েছে। কালিদাসের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' ও 'মালবিকাগ্নিমিত্রম' (খ্রী: চতুর্থ শতক), বানভট্টের 'হর্ষচরিত' (খ্রী: ৭ম শতক), ভবভূতির 'উত্তররামচরিত' (খ্রী: ৭ম-৮ম শতক), বিশাখ দত্তের 'মুদ্রারাক্ষস' (খ্রী: ৫ম শতক), 'হরিবংশ' (খ্রী: ২য় শতক) প্রভৃতি গ্রন্থ গুলি লক্ষ্য করলে এর প্রমাণ পাওয়া যায়।[২] *(a,b)* বানভট্টের 'হর্ষচরিত' ও বিশাখ দত্তের 'মুদ্রারাক্ষস' নাটকে যম পট প্রদর্শনের বিস্তৃত চিত্র দেখা যায়। মানুষ মারা গেলে তার পারলৌকিক পট দেখিয়ে বিভিন্ন বিবরণ প্রদান করা হয় এই যম পটের সাহায্যে। বৌদ্ধ সাহিত্যের মধ্যে 'সারত্থপকামিনী' (খ্রী: ৫ম শতক), 'সংযুক্তনিকায়: খন্দসংযুক্ত' (খ্রী: পূ: ৬ষ্ঠ শতক) এবং জাতক গ্রন্থের মধ্যেও পটের বর্ণনা পাওয়া যায়।[৩]

প্রথমদিকে রামায়ণ-মহাভারত এবং অন্যান্য পৌরাণিক ও বৌদ্ধ কাহিনী অবলম্বন করে সম্ভবতঃ পট আঁকা হত। পরবর্তীকালে বাংলাদেশে লৌকিক দেব দেবীর কাহিনী অবলম্বনে পট আঁকা শুরু হয়। পটচিত্র গুলি

বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় এর বিষয়গুলি পাঁচটি ভাগে বিভক্ত, যেমন- পৌরাণিক, প্রকৃতি ও স্থির চিত্র, ঐতিহাসিক বিষয় সম্বলিত, দৈনন্দিন জীবনচিত্র ও ব্যঙ্গচিত্র। পৌরাণিক চিত্রসমূহে মহাযোগী শিব, নটরাজ শিব, কৃষ্ণ কর্তৃক বকাসুর বধ, বামন কর্তৃক বালিবধ, ব্রহ্মা, শিব পার্বতী, নারায়ণের কুর্মাবতার, স্তন্যপানরত কৃষ্ণ, শিশু কৃষ্ণ কোলে যশোদা, হনুমানের বুকে রাম সীতা, সতী দেহ কণ্ঠে মহাদেব, কমলে কামিনী, জগন্নাথ ও কালি রূপ প্রভৃতি বিষয়গুলি চিত্রিত হয়েছে। প্রকৃতি ও স্থির চিত্রে বিভিন্ন প্রাণী ও পশু পাখি স্থান পেয়েছে। যেমন- গলদা চিংড়ি, জোড়া মাছ, সবুজ টিয়া, শেয়াল প্রভৃতি। ঐতিহাসিক ঘটনার মধ্যে গৌর নিতাই, ঝাঁসির রানী লক্ষ্মীবাঈ, ব্রিটিশ সৈন্যের কুচকাওয়াজ ইত্যাদি বিষয় রয়েছে। দৈনন্দিন জীবন চিত্রের মধ্যে রয়েছে খেমটা নাচ, প্রসাধন, সেতারবাদিকা, সঙ্গীতজ্ঞ, কেশবিন্যাসরত বালিকা, দর্পণ হাতে নারী, বাবুকে হুকা দান, খুনের বিচার, তারকেশ্বরের নারী প্রভৃতি চিত্র। এছাড়া ব্যঙ্গচিত্রের বিষয় ছিল বাবু, সূরা ও সাকী, বৈষ্ণব ও বেশ্যার প্রেমালাপ, পদতলে প্রনয়ী, নারীর পদতলে পড়ে বাবু ইত্যাদি।[৪] এই সকল পটের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল অশিক্ষিত সমাজের মানুষকে চিত্রের মাধ্যমে শিক্ষিত করে তোলা। তাছাড়া সামাজিক অসংলগ্নতাও এই গানের মধ্য দিয়ে ধিক্কৃত হয়েছে। সবচেয়ে বড় কথা ছিল সামাজিক অসঙ্গতিগুলিকে শুধরানোর চেষ্টা করা। এক কথায় পটুয়াগণ নীতি শিক্ষার মাধ্যমে সমাজের উন্নতি সাধনের কাজে লিপ্ত ছিলেন।

বাংলায় পটচিত্রের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ:

বাংলায় প্রাচীনকাল থেকে পটুয়াগানের প্রচলন ছিল। বাংলাদেশে প্রাক্-আর্য যুগ থেকে সংগীত সহযোগে পট প্রদর্শনের রীতি চলে আসছে। বৌদ্ধ যুগে যমপটের বিশেষ প্রচলন ছিল। তৎকালে তিব্বত, জাভা, বোর্ণিও প্রভৃতি স্থানে পটচিত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। বাংলাদেশে মুসলমান বিজয়ের প্রাক্কালে ইসলামী ধর্ম প্রচারকদের আগমন ঘটে এবং তাদের হাত ধরে বাঙালী জনসাধারণের মধ্যে ইসলাম ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে তৎকালীন দেশীয় প্রচার পদ্ধতির প্রচলিত মাধ্যম হিসেবে 'পটচিত্র প্রদর্শন কলা' প্রদর্শিত হতো। তাঁরাই প্রথম এদেশে মুসলমানী পটের প্রচলন করেন।

বাংলায় নব্য বৈষ্ণব ধর্মের পথপ্রদর্শক ছিলেন শ্রীচৈতন্যদেব। তিনি তুর্কি আফগান যুগে হিন্দু বর্ণের নিম্ন বর্ণ ও অন্তজ্য শ্রেণীর মধ্যে ভক্তি আন্দোলনের জোয়ার এনেছিলেন। সেই জোয়ারে সিক্ত হয়েছিল বাংলার চিত্রকলা। এই গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের লোকপ্রিয়তা বিশেষভাবে ধরা দিয়েছিল পট চিত্র শিল্পের মধ্যে। চৈতন্য জীবন কথা, কৃষ্ণলীলা বিষয়ক দৃশ্যাবলী সুন্দর ভাবে ফুটে উঠেছিল পটুয়াদের হাত ধরে। এছাড়াও সাঁওতাল জন্মকথা ও কাহিনী বিষয়ক 'কোরিয়াক কথা', মুসলিম মহাত্মা ও গাজী পীরদের বীরত্ব ও অলৌকিক ক্রিয়া কলাপ, পুরাণ, মহাকাব্য প্রকৃতি বিষয়ও অন্তর্ভুক্ত ছিল।

এই পটুয়া গানের পূর্ণ বিকাশ দেখতে পাওয়া যায় কালীঘাটের পটে। তবে এখানেও ধর্মীয় বিষয় প্রাধান্য পেয়েছে। পট চিত্রে কালি, দুর্গা, শিব-পার্বতী, গনেশ, কার্তিক, লক্ষ্মী-সরস্বতী, যশোদা-কৃষ্ণ, জগদ্ধাত্রী, রাধা-কৃষ্ণ, হনুমান, চৈতন্য, ষড়ভূজা প্রভৃতি দেবদেবীর বিষয় বর্ণিত হয়েছে।

কালীঘাটের পট, উইকিপিডিয়া

শৈলীগত বিচারে ও অবস্থান ভেদে এই পটুয়াকে চার ভাগে ভাগ করা যায়।

১) সাঁওতাল উপজাতির জন্মকথা ও কাহিনী বিষয়ক চক্ষুর্দান পট- যা পুরুলিয়া ও বাঁকুড়ার উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে দেখা যায়।

২) যমপট- যা বাংলার হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত ছিল।

৩) গাজী পট- এটি পূর্ব ও দক্ষিণ বাংলায় প্রচলিত গীত এবং

৪) হিন্দু পুরাণ, মহাকাব্য, কৃষ্ণলীলা ও চৈতন্য লীলা বিষয়ক পট- মেদিনীপুর, বর্ধমান, নদীয়া, বীরভূম, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়ায় প্রচলিত গীত।[৫]

সুতরাং বলা যায় পটুয়াদের উপস্থিতি পশ্চিমবঙ্গের নানাস্থানে। যেমন উত্তর-পশ্চিম বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, বীরভূম, মেদিনীপুর, হাওড়া, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা প্রভৃতি। এর মধ্যে মেদিনীপুরের পটের বিষয়বস্তুতে ও পটুয়া জীবন বোধে বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। মেদিনীপুরের পটুয়াগণ হিন্দু ও মুসলমান দ্বৈত সত্তাকে বজায় রেখেছেন। তাই অনুমান করা যায়, মেদিনীপুর তথা পূর্ব মেদিনীপুর ছিল পটুয়া সংগীতের শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র। এই অঞ্চলের পটুয়াগণ ধর্মীয়, সামাজিক ও সমসাময়িক ঘটনা অবলম্বনে পট রচনা করেন ও সেই অনুযায়ী গান রচনা করে গাইতেন। বিভিন্ন কাহিনীর মধ্যে বেহুলার কাহিনী বিশেষ জনপ্রিয় ছিল। ১৯৪২ এর আন্দোলনের সময় সাহেব পট বা ইংরেজ পট মেদিনীপুরের গ্রামে গ্রামে বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল।

পূর্ব মেদিনীপুরের পটুয়া সমাজ:

বাংলার অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় পূর্ব মেদিনীপুরে পটুয়াগণ অধিক মাত্রায় বসতি স্থাপন করেছিলেন। সুতাহাটা থানার চৈতন্যপুর, আকুবপুর, কেশবপুর, খেজুরি থানার দেউলপোতা, দাসপুর থানার বাসুদেবপুর ও নাড়াজোল, নন্দীগ্রাম থানার নানাকারচক, কুমিরমারা, কুলাপাড়া, সুন্দি, মহিষাদল থানার ঠেকুয়াচক, পিংলা থানার মালিগ্রাম ও নয়াগ্রাম, তমলুক থানার সিরুই, পাঁশকুড়া থানার কেশবপুর প্রভৃতি এলাকার পটুয়াগণ বিশেষ পরিচিতি লাভ করেছিলেন। মেদিনীপুরের পটুয়াগণ ছিলেন কালীঘাটের পটুয়া সমাজের পূর্বপুরুষ। এই পটুয়া ঘরানার মধ্যে অন্যতম হলো 'ত্রিবেনী সমাজ গোষ্ঠী' বা 'স্কুল' - এর অন্তর্গত তমলুক কালীঘাট পট। মোটা কাগজ জুড়ে জুড়ে লম্বা করে উপর থেকে নিচ পর্যন্ত ছবি এঁকে গান করেন এই পটুয়াগণ। মূলত রামায়ণ-মহাভারত ও অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের কাহিনি এই পটে ফুটে উঠত। এর অঙ্কন পদ্ধতিতে অভিনবত্বের ছোঁয়া রয়েছে। নানা ধরনের গাছ গাছালির ফল, ফুল, পাতা থেকে রস সংগ্রহ করে তুলির টানে তুলোর সাহায্যে পট তৈরি করতেন।

নয়াগ্রাম পটচিত্র, উইকিপিডিয়া

মহিষাদল থানার ঠেকুয়াচকে দু-ধরনের পটের নিদর্শন পাওয়া যায়। এছাড়া এখানে আমদাবাদে প্রচলিত পটের মত পটও দেখা যায়। বিভিন্ন ধরনের পট এই গ্রামে লক্ষ্য করা যায়। চিত্রকরদের মধ্যে কালিপদ, সুরেন, বসন্ত, ভূষণ ও গুণধর নামক চিত্রকরগণ ছিলেন দক্ষিণী ধারার বাহক। এছাড়া অজিত, অমর, জহর প্রমূখ

চিত্রকরদের আঁকা চিত্র অতুলনীয়। চীন বা জাপানি শিল্পীদের মত অতি হালকা রঙের জমির উপর সূক্ষ্ম ও সামান্য তুলির টানে তারা বাংলায় পট তৈরি করতেন। পশ্চিমবঙ্গের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের মিউজিয়ামে এর নিদর্শন রয়েছে। ঠেকুয়া ঘরানার উৎকৃষ্ট পট হলো 'বেহুলা পট'। পিংলা থানার নয়াগ্রাম ও মালিগ্রাম ঘরানার চিত্রকরগণ ঠেকুয়া ঘরানাকে অনুসরণ করেছে। নাড়াজোল ঘরানার পটশিল্পে যেমন বিরাট পটভূমি ও জমজমাট রঙের উজ্জ্বলতা আছে। সেখানে ঠেকুয়া ঘরানা বা পিংলা ঘরানার পটশিল্পে রয়েছে হালকা ভাঙা রঙের ফুরফুরে হাওয়া। হালকা নীল রঙের নদীর জলে কালো কালো টানের নৌকা গুলি লাফিয়ে লাফিয়ে চলেছে বাতাসের টানে। প্রাকৃতিক দৃশ্যের মধ্যে মঙ্গলকাব্যের কাহিনি ফুটে উঠেছে। অন্যদিকে আমদাবাদ ঘরানার বীরেন চিত্রকরের পটে উজ্জ্বল নীল রঙের উপর সাদা বুটিকের কাজ, ঘন লাল রঙের উপর সাদা অলংকরণ প্রভৃতি লক্ষ্যনীয়।

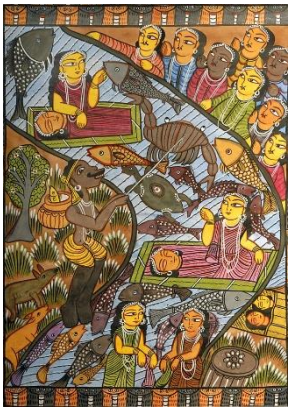

বেহুলা পট, উইকিপিডিয়া

১৯৪৫ সালে তৎকালীন অধ্যক্ষ দেবপ্রসাদ ঘোষ একটি ইংরেজি নিবন্ধে মেদিনীপুরের পটের বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে জানিয়েছেন যে এই জেলার জড়ানো পটগুলিতে বিস্তৃত অলংকরণ সহ এক একটি ফলক ভিড়ে পরিপূর্ণ। এই জড়ানো ফলকের প্রথম ফলকে দেবদেবীর প্রতিকৃতি স্পষ্ট ভাবে চিত্রিত হয়েছে। এখানকার কৃষ্ণলীলা পটগুলিতে দেব-দেবীর মুখ তিন চতুর্থাংশ দেখা যায়। তবে আঙ্গিকগত বৈশিষ্ট্য হলো Shad এর ব্যবহার, যেগুলি বিশেষভাবে ফুটে উঠেছে ঘোড়া, হাতি ও গরুর চিত্রগুলিতে। মেদিনীপুরের পটশিল্পের সঙ্গে দক্ষিণ ২৪ পরগনার মিল পাওয়া যায়। পাঁশকুড়া, কেশবপুর, চৈতন্যপুর, আকুবপুর, তমলুক প্রভৃতি অঞ্চলের পটুয়াগণ এই বিষয়ে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। প্রধানতঃ প্রাচীন তাম্রলিপ্ত বা তমলুকে এর ব্যাপক প্রচলন ছিল। তমলুকের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং উড়িষ্যার সঙ্গে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক মিলনক্ষেত্র রচিত হয়েছিল বলে এই অঞ্চলে সম্ভবত পটুয়া গানের প্রথম উদ্ভব ও বিকাশ ঘটেছিল।

মেদিনীপুরের পটের বিষয়বস্তু:

লোকসঙ্গীতের অন্যান্য বিষয়ের মত পটুয়া গানের বিষয়বস্তু বৈচিত্র্য পরিপূর্ণ। বিষয়ভাবনা ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ পট শৈলীর উপর ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। পটুয়াগণ হিন্দু-মুসলমান ও খ্রিস্টীয় পট এঁকে ভারতের মাটিতে এক নতুন ধর্ম সমন্বয়ের দৃষ্টান্ত রচনা করেছেন। মেদিনীপুরের পটুয়াদের মধ্যে ছয়টি শ্রেণী রয়েছে- বসনতরী, সাতকড়ি, আটপড়া বা আটকুড়ি, চৌপলকাটা, কাটাকাটা এবং বেজো।[৬]

মেদিনীপুরের পটুয়াদের রচনাশৈলীর অলংকরণ ও সূক্ষ্ম কর্ম বিষয় নৈপুণ্যের গাঁথা। কৃষ্ণলীলা, বেহুলা লখিন্দরের কাহিনি, রামায়ণ মহাভারতের কাহিনি, চৈতন্যদেবের গৃহত্যাগের ঘটনা, চাঁদ সদাগরের কাহিনি,

ইংরেজ বিরোধী সংগ্রাম প্রভৃতি উল্লেখ্য। কৃষ্ণ বিষয়ক পটগুলির মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্যের রূপ প্রকাশ পায় না। সেখানে সাত্ত্বিক মাধুর্য রূপেরও প্রকাশ নেই। নিতান্ত লৌকিক রূপটি তাদের গানে ফুটে ওঠেছে। উদাহরণস্বরূপ-

"কানিয়া কদম্বমূলে নাগরিয়া থানা,
বনফুল গাঁথিয়ে কৃষ্ণের গলে বনমালা।
হাত বাঁকা পা'য় বাঁকা বাঁকা মাজাখানি,
চরণের নূপুর বাঁকা চুড়ায় টানুনি।।'"[৭]

রামায়ণের কাহিনি অবলম্বনে রচিত পটুয়া গান হলো রামলীলা। সিন্ধু মুনি বধের বর্ণনা সম্বলিত একটি রচনা হল-

"রজ রাজার পুত্র নামে দশরথ
সভা করে বসে আছেন যত প্রজাগণ।"[৮]

তমলুকের ও পাঁশকুড়া থানার পটীদারগণ কেউ কেউ কুখ্যাত ডাকাত মনোহর ফাঁসুড়ের পট দেখিয়ে বাড়ি বাড়ি ভিক্ষা করতেন। এই কাহিনী অবলম্বন করে অনেক প্রাচীন পল্লী কবিও কাব্য রচনা করেছেন। কুঞ্জ বিহারী দাস ছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম। বৈষ্ণবচক অঞ্চলে প্রাপ্ত মনোহর ফাঁসুড়ের একটি পট মেদিনীপুর সংগ্রহশালায় রয়েছে। গানটির কয়েকটি লাইন লক্ষ্য করলেই পটুয়াদের কবিত্ব শক্তির সাথে সাথে সনাতন ভাবধারা অনুভব করা যায় -

"একদিন সত্যপীর মনেতে ভাবিয়া।
সিন্ধু রাজার দেশে আমি পূজা নিব গিয়া।।
সিন্ধু রাজার দেশে গিয়া আশীষ করিব।
কিছুদিন পরে তার সন্তান ভেজিব।।"[৯]

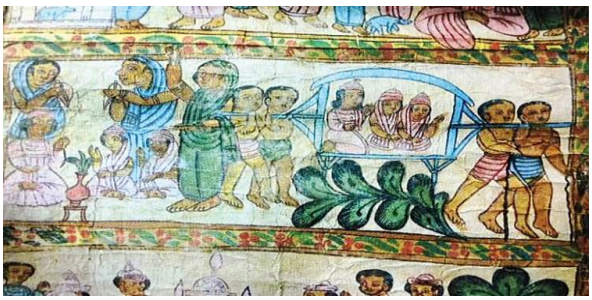

মনোহর ফাঁসুড়ে পট, "পটুয়াজ অ্যান্ড পট আর্ট ইন বেঙ্গল" গ্রন্থ থেকে প্রাপ্ত

মেদিনীপুরের পট রচনায় রাজনৈতিক প্রভাব:

মেদিনীপুর থেকে প্রাপ্ত জড়ানো পট তথা scroll painting উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে সৃষ্টি হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল চন্ডীমঙ্গল চিত্র। এখানে দেবী দুর্গার দশ হাতে ও মুখে ছায়া বৃত্তের ব্যবহার করা হয়েছে। রাজনৈতিক পটভূমির পরিবর্তনের সাথে সাথে এই পট রচনার ক্ষেত্রে পরিবর্তনের ঝড় উঠে। একে একে স্বাধীনতা পট, সাহেব পট, স্টিমার পট, সিনেমা পট, পরিবার পরিকল্পনা পট, ডাক্তারবাবু খুন পট, বিদ্যাসাগর পট, মাইলোর গান পট ইত্যাদি বেশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। এমনকি উপজাতি বিদ্রোহে যাঁরা শহীদ হয়েছিলেন তাঁদের নিয়ে ফাঁসির মঞ্চে জীবনের জয়গান' গাওয়ার কাহিনি রচিত হয়েছিল।

ত্রয়োদশ শতকে সুলতানি আমলে মুসলিম সুলতানদের মন জয় করার জন্য পটুয়াগণ মুসলিম সন্তদের অলৌকিক ক্ষমতা ও মাহাত্ম্য প্রচারের জন্য গাজীর পট, মহম্মদ মঙ্গল ইত্যাদি পট রচনা শুরু করেছিলেন।

এছাড়া পটুয়াদের রচনায় সাধারণ মানুষের অত্যাচারিত হওয়ার বিভিন্ন ছবি ধরা দিয়েছিল। ১৯৪৭ সালের দাঙ্গা ও দেশভাগের পরের বিভিন্ন ঘটনা ফুটে উঠেছে পটুয়া গানে। ১৯৪২ সালে সরকারিভাবে 'সাহেব পট' দেখানো নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। তা সত্ত্বেও নীল বিদ্রোহ, চুয়াড় বিদ্রোহ, সিপাহী বিদ্রোহ প্রভৃতির কাহিনি অবলম্বন করে মেদিনীপুরের পটুয়াগন পট রচনা করেছিলেন। চুয়ার বিদ্রোহ সম্পর্কে রচিত একটি পটুয়া গানের উদাহরণ হল-

"এই মাটির চুয়ার গোঁয়ার বীর,
তারা ধরিল টাঙ্গি ধনুক তীর।
রক্ত দিয়েছিল বুক পেতে তারা,
মানেনি ইংরাজের নতুন ধারা।।"[১০]

১৯৪২ সালের আন্দোলনের সময় পটুয়াদের রচিত সাহেব পটের গান নিয়ে নিষেধাজ্ঞা জারি হওয়ায় গানের ভাষার পরিবর্তন ঘটতে থাকে। কারণ চিত্রিত সাহেব পটে এমন অনেক ছবি দেখতে পাওয়া যায় যা গানের সাথে মেলে না। অনুমান করা হয় ডাকাতের পট যা নিছকই ডাকাতির বিষয়ে রচিত, সেগুলি পরবর্তীকালে চুয়াড় বিদ্রোহের নায়ক যুগল কিশোরের কাহিনীর সঙ্গে মিশে গেছে। সাহেব পটের বিষয়বস্তুর মধ্যে ছিল ইংরেজের অত্যাচারের কাহিনি। ভারত ছাড়ো আন্দোলনের কালেও মেদিনীপুরে পটুয়া গান রচিত হয়েছিল যা তাদের রাজনৈতিক সচেতনতার পরিচয় বহন করে।

দিল্লি দাঙ্গা ও গাজী পট, উইকিপিডিয়া

উপসংহার:

যদিও পটুয়া গান বর্তমানে গ্রামবাংলায় প্রচারিত বিলীয়মান লোকসংস্কৃতির একটি অধ্যায়ে পরিণত হয়েছে। তবে ভারতের বিভিন্ন স্থানে এর বিশেষ প্রসার ঘটেছে। মুম্বাই, আমেদাবাদ, হায়দ্রাবাদ, কেরালা, কানপুর, গুজরাট, দিল্লি, পাটনা, পুনে, গয়া প্রভৃতি স্থানে পটশিল্প ছড়িয়ে পড়েছে। এমনকি বিদেশের মাটিতেও এই শিল্প জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। যেমন- মন্টু চিত্রকর ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত ছাড়াও অস্ট্রেলিয়া, ইন্দোনেশিয়ায় তাঁর পটচিত্র প্রদর্শন করেছেন। প্রবীণ পটুয়া গুরুপদ চিত্রকর অত্যন্ত দক্ষতার সাথে পট আঁকা ও পটের গান গেয়ে বাঙালির মন জয় করে নিয়েছেন। তিনি ২০০৪ সালে জাতীয় পুরস্কার পেয়েছেন। ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, স্পেন ও ইতালিতে তিনি 'কলাশ্রী' পুরস্কার পেয়েছেন। আনোয়ার চিত্রকর রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এবং দিল্লির পর্যটন কেন্দ্র থেকে পুরস্কৃত হয়েছেন। তিনি ২০০৬ সালে জাতীয় পুরস্কারও পেয়েছেন। ফলতঃ বলা যায় পট শিল্প আজ জাতীয় স্তরে প্রসারিত। বাঙালির একটি ঐতিহ্য হল এই পটুয়া গান। তাই পট গীতিকে জাতীয় সাহিত্যের একটি বিশেষ অঙ্গ বলা যায়। বর্তমানে পটচিত্র নিয়ে বিভিন্ন workshop, exhibition করা

হয়। বর্তমানে প্রাকৃতিক দুর্যোগ, করোনা পরিস্থিতি প্রভৃতি সাম্প্রতিক বিষয়ের প্রতিফলন দেখা যায় পটুয়া গানে। শিক্ষা ক্ষেত্রেও পটশিল্পের বিশেষ গ্রহণযোগ্যতা শুরু হয়েছে।

মেদিনীপুর জেলার কিছু কিছু স্থানে এখনো পটুয়া গানের প্রচলন আছে। পূর্ব মেদিনীপুরের চন্ডিপুরের নিকট হাঁসচড়া অঞ্চলে গোলাপ পটুয়া বর্তমানে বিভিন্ন স্থানে পটচিত্র দেখিয়ে জীবিকা নির্বাহ করেন। পটুয়াগন যখন বাড়ি বাড়ি ঘুরে কোন বিশেষ পট দেখান, তখন গানের মধ্যে পটের বিষয়বস্তু সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেন। সাধারণ গ্রামবাসী শুনে তৃপ্ত হতেন। বিশেষতঃ মহিলা ও বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা এতোটাই মুগ্ধ হতেন যে বারবার দেখানোর অনুরোধ করতেন এবং অতিরিক্ত পারিশ্রমিক দিতেন। অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে পটুয়ারা সুরেলা গানের মাধ্যমে কাহিনির বিবরণ দিতেন। আর অলক্ষ্যে লোকশিক্ষার কাজ করে যেতেন। সংগীতকে পরিপূর্ণতা দান করে তার বক্তব্যের বাণী, সুরের বিন্যাস এবং উভয়ের মধ্যে গড়ে ওঠা রূপকল্প বা Image। পটুয়া সংগীতের মধ্যে এই শিল্পরূপ ফুটে উঠেছে। জীবন ও জীবিকার উদ্দেশ্যে এই গান রচিত হলেও এর নান্দনিকতার বিষয়টিও অস্বীকার করা যায় না। পরিবর্তিত অর্থ সামাজিক পরিবেশে পটশিল্প ও পটুয়াগান যদিও অবলুপ্তির পথে তথাপি নতুন উদ্যোগ ও যুগোপযোগী সৃষ্টিকর্মে এই পটশিল্প চর্চা সংগীত চর্চার ক্ষেত্রে আরো বিস্তৃতি লাভ করতে পারলে প্রাচীন এই শিল্পকলা নতুনভাবে প্রতিভাত হবে।

তথ্যসূত্র:

১. ইন্ডিয়ান ফোকলোর, ভলিউম ওয়ান, নং- ওয়ান, কলকাতা, ১৯৫৬, পৃ. ৬০।

২. পটুয়া সংগীত গুরুসদয় দত্ত, Folk Art and Crafts of Bengal, The collected papers, Kolkata 1990. ভূমিকা, পৃ. ১৬-১৮।

a. লোকায়ত বাংলা সুনীল চক্রবর্তী, কল্যাণী প্রকাশন, ৩ ব্রিটিশ ইন্ডিয়া স্ট্রীট, কলকাতা ১৯৬৯, লোকচিত্রকলা অধ্যায়, পৃ. ৪।

b. ইন্ডিয়ান ফোকলোর, ভলিউম ওয়ান, নং- টু, কলকাতা, ১৯৫৬, পৃ. ৮৫।

৩. লোকায়ত বাংলা সুনীল চক্রবর্তী, কল্যাণী প্রকাশন, ৩ ব্রিটিশ ইন্ডিয়া স্ট্রীট, কলকাতা ১৯৬৯, লোকচিত্রকলা অধ্যায়, পৃ. ৪।

৪. পট- পটুয়া, পট গীতি; বারিদ বরুণ ঘোষ, বিশ্ববিদ্যা পরিচয়, কলকাতা, ১৯৯২, পৃ. ১৫ - ১৬।

৫. মেদিনীপুর: ইতিহাস ও সংস্কৃতির বিবর্তন (৩য় খন্ড), সম্পাদনা প্রণব রায়, সাহিত্য লোক, কলকাতা, ২০০২ পৃ. ২১৩।

৬. তদেব, পৃ. ২১৬।

৭. বঙ্গীয় লোকসংগীত রত্নাকর (৩য় খন্ড), ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, পশ্চিমবঙ্গ লোক সংস্কৃতি গবেষণা পরিষদ, কলকাতা, ১৩৬৭, পৃ. ১০৪২।

৮. বঙ্গীয় লোকসংগীত রত্নাকর (৩য় খন্ড), ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, পশ্চিমবঙ্গ লোক সংস্কৃতি গবেষণা পরিষদ, কলকাতা, ১৩৬৭, পৃ. ১০৪৪।

৯. তদেব, পৃ. ১০৪৮।

১০. ঝাড়গ্রামের পটুয়া গান; বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, পশ্চিমবঙ্গের লোকজীবনে লোকসংস্কৃতি, কলকাতা, ১৩৯৭, পৃ. ৩২।